বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা

বিশ্বজননী শ্রী শ্রী মা

বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা

ব্র০ গীতা ব্যানার্জ্জী
এম. এ., পি. এচ. ডি., পুরাণাচার্য্য

প্রকাশক :
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ
কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯৪০৮

তৃতীয় সংস্করণ

সেপ্টেম্বর, ২০০৯

মূল্য : ২০/- টাকা

লেজার কম্পোজিং :
অনুপ প্রিন্টার্স
রামাপুরা, বারাণসী - ২২১০০১
ফোন : ৪৫১১৭৯

মুদ্রক :
মহাবীর প্রেস
ভেলুপুরা, বারাণসী - ২২১০০১

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা

'ভুবনে ভুবনে একি সমারোহ জাগিয়া উঠিছে ঐ।' সাগরের হিল্লোলে বিহগের কল্লোলে অনলে-অনিলে পর্বত তরুরাজির তলে তলে মানব হিয়ার গীত-মধুর তালে তালে কিসের এই নবচেতনা ? কি কারণে ঊষার এই অরুণ কিরণে এত রক্তিচ্ছটা ? আনন্দ সায়রে আজি এত উজানের বাহার ? কর্ণকুহরে-ধ্বনিত হল এই গীতি—

"আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।"

ওগো মানব মন! তুমি জাগো জাগো। ঐ দেখ উদয়রবি গেয়ে গেল তাঁর উদয়-তীর্থের গান—

বিশ্বজননী জগদ্‌হৃদয় বাসিনী
সুর নর বন্দিনী হিমগিরি নন্দিনী
আজি জনম লগনে
তোমার শ্রীচরণে শত শত প্রণাম।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের শতবর্ষের শুভ' জন্মজয়ন্তীর পুণ্যময়লগ্নে বিশ্বজননীর চরণতলে

সমবেত হয়েছে আজ বিশ্বমানব। ভারতেও আজ তারই নবচেতনা দেখা দিয়েছে। সাধু-সন্ত, মহন্ত-মহামণ্ডলেশ্বর, রাজনীতিক, অর্থবিদ্, সমাজবিদ্, দার্শনিক, শিক্ষাশাস্ত্রী, শিক্ষাবিদ্, মনীষী, রাজা-মহারাজা সকল শ্রেণীর শ্রেষ্ঠমানবের হৃদয়ে আজ একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; একই প্রতিশ্রুতি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের শতবর্ষের শুভ আবির্ভাবের মঙ্গলময় উপচারের মহাপুণ্য লগ্ন সমাগত। আজ আমরা শ্রদ্ধাবনত হয়ে মায়ের চরণে যেন অর্পিত করতে পারি নিজেদের এই তুচ্ছতম জীবন-উপহার। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত মায়ের পূতপুণ্যময়চরিত চিত্রায়ণের দ্বারা মায়ের চরণে প্রণতি জানাই।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি ত্রিপুরা জেলার শ্যামল সুষমায় মণ্ডিত খেওড়া গ্রামে ৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৬ সনে (বাংলা ১৯শে বৈশাখ, ১৩০৩ সনে) বৃহস্পতিবারে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পবিত্রক্ষণে গ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রী বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ও ভক্তিমতী মোক্ষদা সুন্দরী দেবীর পর্ণকুটীরে এক দেবশিশুর আবির্ভাব হল। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় শঙ্খ বেজে উঠল। পাখীর কলকাকলিতে ধ্বনিত হল আগমনী গানের তান। উষার অরুণরাগ-রঞ্জিত তরুলতা-পল্লবে সূচিত

হল দেবীর পুণ্যময় আবাহন। চতুর্দিকে আনন্দের রোল।

কবিকণ্ঠ গেয়ে উঠল —

শতবরষ আগেরে ভাই শতবরষ আগে
খেওড়া গ্রামের মাঝে,
মা আনন্দময়ী জাগে।
রাত্রীশেষে প্রভাত পাখী গানটী যখন গাবে
খেওড়া গ্রামে অরুণরাগে
আনন্দময়ী জাগে॥
দিদিমার গায়ে দেবদেবীদের পুণ্য পরশ লাগে
পুষ্পবৃষ্টি স্তুতির মাঝে
আনন্দময়ী জাগে॥

ঐ অনিন্দ্য সুন্দর শিশুটির আবির্ভাবের কিছুদিন পূর্ব হতেই জননী মোক্ষদা সুন্দরী দেবীর নানারূপ দেবদেবীদের দর্শন হত। তাঁর হৃদয় মন প্রাণ আনন্দধারায় অভিষিক্ত হত। প্রায় একমাস পূর্বে বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্যের মাতা শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী স্বীয়পুত্রের পুত্র কামনায় কসবার বিখ্যাত কালী বাড়ীতে যান দেবীর চরণে প্রার্থনা জানাতে। কিন্তু একি হল? তিনি যে দেবীর চরণে পৌত্র প্রার্থনা করতে গিয়ে পৌত্রী চেয়ে বসলেন। বিধির বিধান অন্যরূপ।

অলক্ষে তাই বুঝি সেদিন নিখিল বিশ্বের বিধাতা হেসেছিলেন। এর কিছুদিন পরই ঐ অলৌকিক কন্যাটির আবির্ভাব। জননী এলেন জগত মাঝারে। "ধন্য হল এ ধরণী তোমার চরণ-রেণুপাতে।"

আবির্ভাবের সময় থেকেই মায়ের পূর্ণ জ্ঞান। জন্মের সময় অন্যান্য শিশুরা যেমন কাঁদে, মা কিন্তু তেমন কাঁদেন নি। তাঁর মুখ-কমল নির্মল হাসিতে ভরা ছিল। পরে জিজ্ঞাসায় মা বলেছিলেন, "আমি তখন খড়ের চালের ফাঁক দিয়ে নিম গাছের ও আম গাছের ডাল দেখছিলাম।"

জন্মের পরদিন প্রাতে একটি ব্রাহ্মণের আগমন। তিনি মাকে দেখে মায়ের নাম রাখলেন 'দাক্ষায়ণী'। মায়ের অত্যুজ্জ্বল গৌর বর্ণরূপ সদ্য ফোটা ফুলের মত চাঁদ মুখ দেখে আহ্লাদিত জননী মার নাম রাখলেন 'নির্মলা'।

এ সম্বন্ধে মায়ের বাণী—"এই শরীরের ধবধবে রং দেখে শরীরের মা নাকি আতুরেই নির্মলা নাম দিয়েছিল। তাই মল না, নির্মল আকাশ অর্থাৎ কিনা ময়লা নেই, মেঘটেঘ নেই, একেবারে পরিষ্কার।"

মার জন্মের পূর্বের সন্তানটি মারা যাওয়ায় মার আবির্ভাবের পরদিন ভোর বেলা থেকেই দিদিমা মাকে তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিয়ে আনলেন। মায়ের শ্রীঅঙ্গের প্রথম শয্যা হল তুলসীদল আর অঙ্গরাগ হল তুলসীমঞ্জরী। এইভাবে আঠারো মাস বয়স পর্য্যন্ত মাকে তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেওয়ান হত। একটু বড় হওয়ার পর শিশুসুলভ ছন্দায়িত গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে মা নিজেই তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিয়ে আসতেন। সেই অপরূপের রূপের আলোয় জনক জননীর হৃদয়মন্দির আলোকিত হয়ে উঠত। 'অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।'

মার আবির্ভাবের ১৩ দিনের দিন এলেন শ্রী নন্দন চক্রবর্ত্তী (দিদিমার মামাশ্বশুর) মাকে দেখতে। দিদিমা (মার মা) কিন্তু সেই কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। একটু বড় হয়ে মা একদিন নিজ জননীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মা, জন্মের ১৩ দিনের দিন নন্দন চক্রবর্ত্তী এসেছিলেন না ?" দিদিমা তো শুনে অবাক। পরে সেই রবাহূত ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসায় জানা যায় যে সত্যই তিনি সেদিন এসেছিলেন। মার পূর্ণজ্ঞান জন্মাবধি। "চিরবিভাসিতা তুমি পরমার পরমপ্রকাশে।"

সুধীপ্রবর শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ

মহাশয়ের উক্তি — "মায়ের সম্বন্ধে এ কথাও বলা যায় যে তিনি অনাদিকাল হতে কি আছেন এবং অনন্ত কাল কি থাকবেন সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সজাগ। মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ স্বরূপজ্ঞানের বিচ্যুতি তাঁর ঘটেনি।"

সকলেই ভাল বাসতেন মায়ের হাসিখুশী রূপটিকে। হিন্দু, মুসলমান সকলেই এই হৃদয়ের ধন পরম আদরের দুলালীকে সমভাবে আদর করতেন। মা যে তাঁদের নয়নমণি। তাই তাঁরা মাকে না দেখে না আদর করে থাকতে পারতেন না। কি যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণে সকলেই মাকে কাছে পেতে চাইতেন।

আর্থিক দৃষ্টিতে পিতার অবস্থা ছিল না স্বচ্ছল, তবে জাগতিক বিষয় বাসনার প্রতি নির্লিপ্ত পরম ধনে ধনী তাঁরা। কন্যা নির্মলাকে যত্নে আদরে লালনে পালনে কোথা দিয়ে যে দিন তাঁদের হত অতিবাহিত, তা তাঁরা বুঝতেও পারতেন না। মাও নিজের সহজ-সরল সরস বাল্যলীলায় ভরিয়ে দিতেন তাঁদের অন্তর।

যদিও মার আরোও অন্যান্য ভাই বোন ছিলেন, তবু যেন জনকজননীর মার প্রতি বিশেষ খেয়াল,

কখনো হয়তো বা শ্রদ্ধামিশ্রিত তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা হত পরিস্ফুট।

শৈশবেই মা কি যেন এক গভীর ভাবে আনমনা হয়ে থাকতেন। উদাস নেত্রে চেয়ে থাকতেন এই বিশ্ব-প্রকৃতির খেলা ঘরের দিকে এই চিরন্তন শিশু। কখনো ডুবে যেতেন চিদ্‌সাগরের গভীর অন্তস্তলে, স্বরূপজ্ঞানে সমাহিতা হয়ে থাকতেন। কিন্তু এ সবের বহি:প্রকাশ তখন কিছুই ছিল না। এ সবের মূলে ছিল মায়েরই অপ্রতিহত খেয়াল। যখন প্রকাশ হবার তখনই প্রকাশ হয়েছে মায়ের স্বয়ং-প্রকাশ চিরউজ্জ্বল চিরভাস্বর রূপ। তার আগে ধূমায়িত হোমশিখার মতই মা নিজেকে আবৃত করে রেখেছিলেন। কত রূপ, কত দর্শন সবই তখন ছিল আলোছায়ার অন্তরালে।

আবার কখনো চঞ্চলা, চপলা বালিকার রূপটি মায়ের দেখা দিত। ব্রত-পার্বণে, পূজায়-কীর্ত্তনে মায়ের খুব স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ হত।

বৈশাখ মাস। বৈশাখী উৎসবে সারা গ্রাম হরষে বিলাসে উল্লসিত মুখরিত হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে ফলে ভরা গাছ। গ্রামের রীতি প্রথমে পাকা আম ঠাকুরকে দিয়ে পূজা করবে। চঞ্চলা, চপলা বালিকা নির্মলা

পুলকিত চিত্তে এক প্রভাতে নিজ জননীকে বললেন, "মা বৈশাখী পূজা হচ্ছে। কাঁচা আম পূজায় দিয়েছো, আমাদের পাকা আম কোথায়?" দিদিমা বললেন—"আমাদের কি আম বাগান আছে যে কোন না কোন গাছে এক আধটা পাকা আম পাওয়া যাবে। কাঁচা আম দিয়েই পূজা করব। যার যেমন শক্তি সে তেমনই পূজা করবে।" বাইরে অন্যদের বাগানে কতগুলি আম গাছ ছিল। কিন্তু দিদিমার নিষেধ ছিল যে কারো গাছ থেকে কখনো ফল পেড়ে আনবে না। গাছ তলায় পড়ে থাকলে কুড়িয়ে আনতে পারো। গ্রাম সুবাদে তা নিষেধ ছিল না। জননীর আদেশ পালনে মায়ের এমনই পূর্ণতা ছিল যে ফলে ভরা আম গাছ যাতে ছোঁওয়া না লাগে তাই দূর থেকে হাঁটতেন।

বৈশাখী পূজার আগের দিন পুকুরে যেতে মা দেখতে পেলেন একটি গাছে অনেক উঁচুতে একটি আম পেকে লাল হয়ে আছে। মার খেয়াল হল যে যদি ঐ আমটি ঝড়ে পড়ে, তবে পূজায় দেওয়া যায়। খেয়াল হবার সঙ্গে সঙ্গেই মা সেখানে গিয়ে দেখেন যে আমটি পড়ে আছে। মা আমটি কুড়িয়ে এনে দিদিমার হাতে দিলেন। দিদিমা বললেন, "পেড়ে আনিস নি তো?" কি করে ঐ আমটি পাওয়া গেছে মা দিদিমাকে

বললেন। দিদিমা আমটি পূজায় দিলেন। মা দিদিমাকে বললেন, "তুমি যেমন আমায় দাও, গাছও দেয়। গাছও তোমার মত দেয় না মা? সেও কিন্তু তোমার মত দিতে পারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে।" দিদিমা এই কথা শুনে হেসে বললেন, "মেয়ের কথা শোনো। পণ্ডিত বাড়ীর মেয়ে কিনা।"

গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সকলেই মার খেলার সাথী বন্ধু ছিল। সকলের সঙ্গেই পরা বাক্স্বরূপিণী মায়ের আলাপ চলত অবিরত। সকল জীবের হৃদয়গুহাবাসিনী মায়ের সকলের সঙ্গেই একাত্মতা ছিল। সাপের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ চিরকালের। একবার একটি সাপকে মায়ের পিঠে ফণা ধরে উঠতে দেখা যায়। পরে সাপটি কোথায় যেন চলে যায়। বনরাজি নীলা প্রকৃতির শ্যামল সৌন্দর্য্যে ভরা সম্পূর্ণ খেওড়া গ্রামই যেন মায়ের একটি ঘর ছিল। সকলের কাছে আহ্লাদে আব্দারে ধীরে ধীরে শশিকলার মত মা বড় হতে লাগলেন।

মায়ের গুরুজনদের আদেশ পালনে পূর্ণতা কখনো হাস্যকর পরিবেশের কারণ হত। একটি নির্দেশন।

একবার মা কিছু বাসন ধোবার জন্য পুকুরে যাচ্ছেন। সঙ্গে পাথরের বাটি ছিল। মায়ের জননী যাবার সময় বলে দিলেন, "পাথরের বাটি নিয়ে যাচ্ছিস। সাবধানে যাস। পারিস তো ভেঙ্গে নিয়ে আসিস।" সত্যই মায়ের হাত থেকে বাটিটি পড়ে ভেঙ্গে যায়। মা ওই টুকরোগুলি সযতনে উঠিয়ে ধুয়ে অন্য বাসনের সঙ্গে নিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়ালেন। দিদিমা এই দেখে সজোরে বলে উঠলেন, "যা বলেছি তাই করলি ? ওলো, বলদি, পাথরের বাটির টুকরোগুলি কি আর জোড়া লাগবে ? মেয়ের যে কি গতি হবে পরমেশ্বরই জানেন।"

পরে মা বললেন যে, মা কখনো পাথরের টুকরো পাথরে ঘষে চন্দনের মত করে পোড়া ঘায়ে লাগাতে দেখেছিলেন, তাই ওই পাথরের টুকড়োগুলি গুছিয়ে আনা হয়েছিল।

মাকে কেউ কেউ বলতো, "মেয়েটা বড় সিধা।" একবার মার ছোটমামা মাকে একটি পিতলের কলসী দেন। একদিন মা পুকুরের থেকে জল ভরে ওই কলসীটি কাঁখে করে নিজের মার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "মা কেবল সিধা সিধা বল, এই দেখ আমি বাঁকা হয়েছি।" বালিকার এই অবোধ শিশু সুলভ

কথায় জননী হেসে উঠেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই মায়ের কাপড় পরার একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হত। সে সময় তো গ্রামদেশে ফ্রক, পাজামা, সেমিজ ইত্যাদির প্রচলন ছিল না। কিন্তু সেই একটি মাত্র পরিধেয় বস্ত্রের পরিধানের পারিপাট্য গুণে হাত-পা ছাড়া শরীরের আর কোন অঙ্গই দেখা যেত না।

যিনি পূর্ণ, তাঁর সব কিছুতেই একটি পূর্ণতার পরশ অনুভূত হওয়া অতি স্বাভাবিক কথা। মার কাজ-কর্ম খুব সুন্দর ছিল। যখন যে কাজটি করতেন একেবারে নিখুঁত। সূচী শিল্প বা বেতের কাজ প্রভৃতি কাউকে করতে দেখলে মা ওই নমুনায় নিজের থেকেই অনেক রকমারী জিনিষ করে ফেলতেন। রান্নাবান্না যখন যা করতেন, খুবই সুন্দর করতেন। এই দেখে দিদিমা একবার বলেছিলেন, "সময়ে সব পারবি।"

মার মামাবাড়ী ছিল সুলতানপুর। সুলতানপুর ছিল বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন মার মাতামহ। তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা মায়ের জননী শ্রীমতী মোক্ষোদাসুন্দরী দেবী। ছেলেবেলায় মা কখনো কখনো নিজের মায়ের

সঙ্গে মামাবাড়ী যেতেন।

খেওড়া ও মামাবাড়ী সুলতানপুর এই দুই জায়গা মিলিয়ে দু-চার মাসই মার স্কুলে পড়া হয়েছিল।

চির সত্য স্বরূপিণী মায়ের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যেত যে শিশুকাল থেকেই মায়ের সঙ্গে কেউ মিথ্যাচরণ করলে মার শরীরে একটি বিপরীত ক্রিয়ার অর্থাৎ অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিত।

মা ধীরে ধীরে কৈশোরে পদার্পণ করলেন। অবশ্য চিন্ময়ী নিত্যসনাতনী মায়ের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি অবস্থা কথার কথা মাত্র। মা বলেন — "আমি আগে ও যা, এখনও তা, পরেও একই থাকব।"

শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাই বলেছেন, "মায়ের জীবনে, এমনকি তাঁর শৈশবাবস্থায়ও যে অপ্রাকৃত ঘটনার প্রাচুর্য্য থাকিবে ইহা মোটেই বিস্ময়কর নহে। কিন্তু ওইগুলি মায়ের মাধুর্য্যময় ও লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের সহিত অনুস্যূত অপূর্ব্ব সমতা ও আনন্দময় স্বভাবের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে মায়ের ব্যক্তিত্ব প্রবল হইলেও উহা তাঁহার ব্যক্তিত্বহীন অব্যক্তপরম

স্বরূপের সহিত অভেদভাবাপন্ন, এমন কি এক বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" অর্থাৎ নির্গুণ, নিরাকার ও সগুণ-সাকার এই দুই এর অপূর্ব্ব সমন্বয়। অধিকার ভেদে সগুণ-সাকার তত্ত্বের আলোচনার অবশ্যই সার্থকতা রয়েছে। তাই শ্রদ্ধেয় ভাইজী বলেছেন, "দেহধারীর ঊর্দ্ধে তাঁহাকে চিন্তা করিতে না পারিলে তাঁহার কর্ত্তব্য পরায়ণতা, প্রসন্নতা, সৌম, উদারতা, সমচিত্ততা প্রভৃতির যে কোন একটি গুণ আদর্শ করিয়া চলিতে হইবে।"

এইখানেই রয়েছে মায়ের পূতজীবন চরিতের লোকত্তর গুণগুলির বারেবারেই অনুশীলন ও অনুধ্যানের সার্থকতা। আমরা ফিরে যাই পুনরায় মায়ের জীবনবেদের পূত ঘটনাবলীর ছন্দায়তনে।

চিরধীরা, অচঞ্চলা, মহাশক্তি মহামায়ার বহি:প্রকাশের চিত্রপটে রূপ পরিবর্ত্তিত হল।

বালিকা নির্মলার কৈশোরে পদাপর্ণের সন্ধি ক্ষণে বিবাহ হল, মহাতীর্থ উদয়তীর্থ এই খেওড়া গ্রামে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে (বাংলা ১৩১৫ সনে, ২৫ শে মাঘ) বিক্রমপুরের শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে। উত্তরকালে এই রমণীমোহন চক্রবর্ত্তীই ভক্ত

সমাজে ভোলানাথ নামে অভিহিত হন। বিবাহের সময় মার বয়স বারো বছর দশ মাস। বিবাহের সময় যাবতীয় লোকোপচার শাস্ত্র বিধিমত গ্রামের এক বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রী লক্ষ্মীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়েছিলেন। তিনি ক্রিয়াদি করাতে করাতে ছলছল চোখে ভোলানাথকে বলেছিলেন, "দাদু, কী রত্ন ঘরে নিলে বুঝবে ভাই।" ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র মাকে দেখে বলেছিলেন, "কাপড়ের উপর দিয়ে গায়ের রং ফুটে ওঠে, এ সাধারণ মানুষ নারে।"

বিবাহের পর মা এলেন শ্রীপুরে ভোলানাথের অগ্রজের সংসারে। ভোলানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী স্টেশন মাষ্টার ছিলেন শ্রীপুরে।

খেওড়া থেকে আসার সময় দিদিমা মাকে বলে দিয়েছিলেন যে নারীর প্রধান কর্ত্তব্য হল সতীধর্ম রক্ষা করা। নিজের প্রাণ দিয়েও সতীধর্ম রক্ষা করতে হয়। ভোলানাথও বলেছিলেন, "আমার অগ্রজ ও ভ্রাতৃজায়ার কথা মেনে চলবে।"

শ্রী রেবতী বাবুর সংসারে অন্ত:পুরচারিণী, আনন্দস্বরূপিণী মায়ের আদর্শ কুলবধূ রূপটি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হল। মা ঐ অল্প বয়সেই গুরুজনদের আদেশ

মতন সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। মায়ের সব কাজেই শ্রদ্ধামিশ্রিত শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতার পরশ অনুভূত হত। ভাসুর ও বড় জার সেবা, রন্ধন-নিপুণতা, ভাসুরের ছেলেমেয়েদের সযতনে লালন, ঘর বাড়ীর স্বচ্ছতা সবটাতেই এক ত্রুটিহীন সুসম্পূর্ণতা। বড় জা অসুস্থ। তাই মা সানন্দে কাজে এগিয়ে আসতেন। বাসনও মা নিজে হাতে মাজতেন। মার স্নেহ মাখা করুণাভরা মুখে ক্লান্তি বা শ্রমের লেশমাত্র চিহ্নও দেখা যেত না। গুরুজনদের কাজ করতে দেখলে দৌড়ে এসে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন বা তাঁকে হাসিমুখে মধুর কথায় সেই কাজ থেকে নিবৃত করে নিজেই করে দিতেন। বড়দের সঙ্গে কথা বলার সময় মাটীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে নম্রভাবে কথা বলা, বড়দের দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ানো, বড়দের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে কথা না বলা, কথায় ব্যবহারে কেউ যাতে আঘাত না পায় এসব দিকে ছেলেবেলা থেকেই মার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

বাড়ীতে অতিথি এলে নিজে মা রান্না করতেন। নিজে অন্তরালে থেকে অতিথি সেবায় যাতে কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কারণ অতিথি যে নারায়ণ। অতিথি সেবায় যদি নিজের

আহারের দেরী হয় সেদিকে মার কোনও ভ্রূক্ষেপই ছিল না। এখানে মার প্রেম, করুণা ও সেবার এক অভিনব ত্রিবেণী রচিত হল।

সেবার কাজে মার অফুরন্ত প্রশংসা। কিন্তু প্রশংসা প্রতিষ্ঠা হতে সম্পূর্ণ উদাসীন এক সীমাহীন নীরবতায় মা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। চির মৌনের গাম্ভীর্য্যও যেথায় মূক হয়ে যায়। স্নেহ কোমলহৃদয় রেবতীবাবু এই কন্যাসমা ভ্রাতৃবধূটির নিপুণ সেবায় ও মিষ্টি ব্যবহার খুব প্রীত হতেন। তিনি মাকে খুব স্নেহ করতেন।

শ্রীপুর থেকে রেবতীবাবু নরুন্দী স্টেশনে বদলী হন। এই সময় দাদামশাই (মার পিতা) ও নিজের মামা বাড়ী খেওড়ার বসতি উঠিয়ে পৈতৃক ভিটায় বিদ্যাকূটে এসে বাস করতে থাকেন। এই বিদ্যাকূটের শ্রী ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর একমাত্র সন্তান ছিলেন শ্রী বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য। ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীও নিজের পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাই খেওড়া গ্রামের ঐ বসতির উত্তরাধিকারী সূত্রে স্বত্তাধিকারী শ্রী বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য। এঁদের গুরু-বংশ ছিল।

নরুন্দীতে অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাষ্টারের স্ত্রীর

একদিন রান্নাঘরে কার্য্যরত মায়ের দেবীরূপ দর্শন হয়।

এ সময় ঘরের কাজ করতে করতে কখনো মা সমাধিতে মগ্ন হতেন। ভাবাবস্থায় কখনো জলের বদলে ঘটিতে রাখা দুধ দিয়েই হাত ধুয়ে ফেলতেন। কখনো বা রান্না ইত্যাদি পুড়ে যেত। মার শরীর সমাধিতে ধীর স্থির পাথরের মত নিশ্চল। আবার হয়তো খেয়াল করে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের কাজে ব্যাপৃত হতেন। মায়ের আদেশ পালনের পূর্ণতায় সকলেই মাকে স্নেহ করতেন।

ভাসুরের মৃত্যুর পর মা ১৮ বছর বয়সে ভোলানাথের কর্মস্থল অষ্টগ্রামে এলেন। আদর্শ গৃহিণীরূপে সমাসীনা মা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পতিসেবায় পূর্ণতা, ঘরের কাজে নিপুণতা সকলকেই মুগ্ধ করল। চিরপ্রসন্নময়ী মার হাসি-ঝলমল রূপ দেখে শ্রী জয়শঙ্কর সেনের স্ত্রী মাকে "খুশীর মা" আখ্যা দিলেন। এখানেই সাধক শ্রীহর কুমার দেবীজ্ঞানে মাকে শ্রদ্ধা করেন। মার প্রতি তাঁর সেই ভবিষ্যদ্ বাণী চির অবিস্মরণীয় হয়ে রইল—

"আমি তোকে মা বলে ডাকছি। একদিন বিশ্বজগৎ তোকে মা বলে ডাকবে।" সবই যেন পূর্ব

হতেই সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত। তাই সাধক শ্রী হরকুমারের ভূমিকা মাতৃভক্তদের কাছে কোন অংশেই ন্যূন নয়।

অষ্টগ্রামে মার ঘনীভূত সমাধির ভাব। মর্ত্তলোকের সঙ্গে পূর্ণ সম্বন্ধ বিচ্ছেদের পর দিব্যধাম বাসিনী মহাভাব স্বরূপিণী সমাধিবিলাসিনী মায়ের আঁখি দুটি নিমীলিত, অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু প্রবাহিত, মুখকমল রক্তিমাভায় রঞ্জিত, অনুপম সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য মণ্ডিত মায়ের সেই অপরূপ রূপ মাধুরী দর্শনে ভোলানাথ অবাক বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে যেতেন। কীর্ত্তনে মহাভাব নদীয়ার সেই গোরারায়ের লীলারই যেন পূর্ণতম প্রকাশ। কিন্তু এর মধ্যেও গৃহকর্মে মার কোন ত্রুটি ছিল না। ভোলানাথকে যথাসময়ে সুস্বাদু রান্না পরিবেশনে তৃপ্ত করা; আবার বাইরে থেকে এসে জল ঘটি ও গামছা যাতে হাতের কাছে পান তার প্রস্তুতি; ঘরবাড়ী, শয্যাদির স্বচ্ছতায় সজাগ দৃষ্টি, সবেতেই যেন পূর্ণতা পরিস্ফুট। সব মা একা হাতে করতেন। অবশিষ্ট সময়ে তাঁতে কাপড় বোনা, সেলাই, উলের কাজ, বেতের কাজ, কার্পেটে সূচী শিল্পের কারুকার্য্যে সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হত। চরকা কেটে সেই সূতো দিয়ে কাপড় তৈরী করেছিলেন। মায়ের হাতের

কাজ কিছু কিছু সংরক্ষিত আছে। আচার আমসত্ত্ব দেওয়া, সকাল সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া, ধূপধূনায় চতুর্দিক আমোদিত মায়ের গৃহদ্বার স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ হয়ে থাকতো। মায়ের রান্না অতি সুস্বাদু ছিল। তাই পাড়া প্রতিবেশীদের গৃহে নিমন্ত্রণে তাঁদের অনুরোধে রান্নার সময় মাকে উপস্থিত থাকতে হত।

ছোট বড় সকলকে খাইয়ে মা খুব আনন্দ পেতেন।

সংসারের সমস্ত কাজ করে রাত্রে ভোলানাথকে খাইয়ে মা নিজের ভাবে বসতেন। রাত্রি শেষে কিছু মুখে দিতেন। এই ছিল মার সারা দিনের খাওয়া, আবার শুরু হত গৃহের কাজ।

ভোলানাথের বাজিতপুরে বদলী হওয়ার আগে মা পিত্রালয়ে বিদ্যাকূটে প্রায় তিন বছর বাস করেন। ১৯১৮ সনে প্রায় ২২ বছর বয়সে ভোলানাথের সঙ্গে মায়ের বাজিতপুরে পদার্পণ। পূর্ণতায় অবস্থিতা শ্রীশ্রী মায়ের লোকশিক্ষা লোকমঙ্গলের জন্য সাধিকার ভূমিকায় লীলা গ্রহণ। বাজিতপুরে মায়ের সাধনার খেলা চরমে পরমে প্রকাশিত হল। একই সময়ে মা সধিকার ভূমিকায় সাধনার খেলা খেলছেন আবার দ্রষ্টীরূপে

সাক্ষীরূপে সব কিছু দর্শনে অখণ্ড জ্ঞানে উদ্ভাসিতা হয়ে বিরাজিতা রয়েছেন। আনন্দলোকের বাণী মুখরিত হয়—

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যান-চোখে
আলোকের অতীত আলোক।"

বাজিতপুরে ১৯২২ সনে ঝুলন পূর্ণিমার নিশীথে মায়ের আপনা থেকেই স্বয়ং দীক্ষা হয়। কিছুদিন পর মামাতো ভাই শ্রী নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের মায়ের বিশেষভাব লক্ষ্য করে প্রশ্ন, "আপনি কে?" এই জিজ্ঞাসায় মায়ের শ্রীমুখ থেকে নির্গত হয় আত্মপরিচয়ের সেই সনাতনী বাণী— "পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ।" বিস্মিত স্তম্ভিত পুলকিত ভোলানাথ মায়ের স্নিগ্ধ পরশে মহাভাবে নিমগ্ন হলেন। মায়ের কৃপা লাভ করে বাবা ভোলানাথ মহাসাধক রূপে রূপান্তরিত হলেন। ভোলানাথের মায়ের থেকেই দীক্ষা।

একবার শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদি মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "লোকচক্ষুর অন্তরালে তোমার এই সাধনার খেলায় কি লাভ হল?" উত্তরে মা বলেন, "তোদের যা দরকার তাই শুধু এই শরীর দিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

অন্যত্র মা বলেছেন, "দেখ শরীরটার গতি তোদের দৃষ্টিতে শিশুকালেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। মধ্যে যোগক্রিয়াদি যখন শরীরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে তখন নানা রকম পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। তাহারও কারণ, যোগক্রিয়ায় শরীরে কি রকম হয়, হয়ত তাহাই ফুটিবার দরকার ছিল তাই হইয়া গিয়াছে।"

সাধনার খেলার সময় জ্যোতি-স্নাত মায়ের শ্রী অঙ্গের জ্যোতিতে চতুর্দিক জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। মা নিজের খেয়ালে নিজেকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখতেন। ভোলানাথের সঙ্গে ১৯২৪ সনে মায়ের শাহবাগ আগমন। এখানে এসে বাজিতপুরে সেই সূক্ষ্মে দেখা আরবদেশীয় ফকির ও তাঁর শিষ্যের সমাধি দর্শন করেন। শাহবাগ থেকে একবার মা সিদ্ধেশ্বরীতে কালী বাড়ীতে আপন খেয়ালে ৭ দিন থাকেন। সেই সময় বর্ষাস্নাত এক প্রভাতে জঙ্গলাকীর্ণ পথে মা ভোলানাথের সঙ্গে গিয়ে সিদ্ধপীঠ সিদ্ধেশ্বরীর আদি সাধনার স্থান দেখালেন। সেই জায়গাকে চিহ্নিত করে রাখতে নির্দেশ দিলেন। সিদ্ধেশ্বরী আদি আসনের পুনরুদ্ধার হল। পরে সেই জায়গাতে বেদী নির্মাণ করে আদি আশ্রমের সূত্রপাত হয়।

ধীরে ধীরে ফুলের গন্ধে ভ্রমরের আনাগোনার

মত মায়ের অলৌকিক পূত চরিত্রের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে মায়ের চরণ প্রান্তে ভক্তদের আগমন হতে লাগল। তাদের মধ্যে সরকারী কৃষি বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় অন্যতম, যিনি উত্তরকালে ভাইজী নামে পরিচিত হন। ভাইজী একদিন সিদ্ধেশ্বরীর বেদীতে শতশত চন্দ্রকিরণ বিনিন্দিত মায়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও শ্রী অঙ্গের স্বর্গীয় লাবণ্য দেখে বাবা ভোলানাথকে বললেন, "মাকে আমরা শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী বলব।"

"শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী" এই নাম চির নূতন চির পুরাতন। যুগে যুগে শত শত বর্ষ ধরে এই নামের সঙ্গে বিশ্বমানবের শাশ্বত আত্মা চিরপরিচিত। কারণ আনন্দ হতে উদ্ভূত নিখিল বিশ্ববাসীর আনন্দই একমাত্র উপাদান। আনন্দেই তাদের অবস্থান ও অন্তে আনন্দেই তাদের বিলয়। তাই আনন্দ স্বরূপিণী মায়ের সঙ্গে বিশ্বের চরাচরের জীবের এত নিবিড় আত্মীয়তা। ঢাকাতে দলে দলে লোক মায়ের দর্শনে আসতে লাগলেন। শ্রী শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কন্যা মার চরণে এলেন যাঁরা উত্তরকালে যথাক্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি ও মায়ের লীলা রচয়িত্রী দিদি গুরুপ্রিয়া নামে খ্যাত হন।

জননীর ভূমিকায় মায়ের লীলার আরম্ভ। শাহবাগে কীর্ত্তনের সময়ে মহাভাবে ফকিরের কবরে মুসলমান যুবকের সঙ্গে মায়ের কোরাণের পবিত্র শব্দ উচ্চারণ ও নামাজের বিধিতে নামাজ পাঠ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ঐ মুসলমান যুবকটির স্বীকারোক্তি কর্ণগোচর হয়, "আমি জীবনে নামাজ পাঠে এরূপ আনন্দ পাইনি; আজ মায়ের সঙ্গে নামাজ পাঠে যেমন আনন্দ পেলাম।" তিনি হরি লুটের বাতাসা গ্রহণ করেন। এরপর শাহবাগের নবাবজাদী প্যারী বানুর অনুরোধে আরেক বার ঐ ফকিরের কবরে মায়ের শ্রীমুখ থেকে পবিত্র কোরাণের শব্দ উচ্চারণ শুনে নবাবজাদী বলেন, "আমি জীবনে কোরাণ শরিফের এমন নির্ভুল স্পষ্ট উচ্চারণ শুনিনি।"

১৯২৬ সনের দীপান্বিতায় মায়ের শ্যামাপূজা অবিস্মরণীয়। সেই কালী প্রতিমা বহুদিন সেবা পূজা গ্রহণ করেছেন ও প্রজ্বলিত অগ্নি আজ পর্য্যন্ত বারাণসীতে ও মায়ের বিভিন্ন আশ্রমের যজ্ঞ শালায় পূজিত হয়ে আসছেন। ঢাকাতে এই অগ্নি স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়েছিল মায়ের অমোঘ বাণী — "এই অগ্নি এক বৃহৎ যজ্ঞে লাগিয়ে দেবে।" সেই অগ্নিতেই বারাণসী আশ্রমে ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৫০ সন

পর্য্যন্ত তিন বর্ষ ব্যাপী অতুলনীয় সাবিত্রী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকাতে শ্রদ্ধেয় ভাইজীর প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সনে রমণার আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং মাতৃ নির্দেশে ১৯৩১ সনে রমণার আশ্রমে শ্রীশ্রী মা অন্নপূর্ণা, শিব প্রভৃতি দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। আশ্রমে সন্ধ্যা কীর্ত্তন ও উষা কীর্ত্তনের আরম্ভেও মা মহিলাদের কীর্ত্তনে সানন্দে উপস্থিত হন।

ঢাকাবাসীরা মায়ের দুর্বার আকর্ষণে আনন্দে মায়ের চরণে তনমন প্রাণ সঁপে প্রেমে পাগলাপারা হয়ে তুমুল কীর্ত্তনে আকাশ বাতাস নিনাদিত করতেন। তাঁদের অন্তরের কথা কবির ভাষায় প্রস্ফুটিত হত—

"তোমার অঞ্চল তলে সুরভিত স্নিগ্ধ ভালবাসা,
সেথা প্রেম, সেথা শান্তি,
সেথা নিত্য আলো আর আশা।"

কিন্তু এ কি হল? সাঙ্গ হল আনন্দের মেলা। এবার বিদায়ের পালা। ১৯৩২ সনে শ্রীশ্রী মা ভাইজী ও ভোলানাথের সঙ্গে ঢাকা থেকে সুদূর হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে পর্বতপাদমূলে দেরাদুন শহরের অনতিদূরে রায়পুরে একটি জীর্ণ শিব মন্দিরে চলে আসেন।

বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গজননী এবার ভারত-জননী ও বিশ্বজননী ভূমিকায় অবতীর্ণা। চরাচরের আত্মা স্বরূপিণী সর্বজ্ঞা মায়ের কাছে দেশ, কাল, পাত্র, ভাষা কোন কিছুরই বাধা নেই। তাই রায়পুরের মত এই ছোট গ্রামেও আমাদের পরমা জননীর কাছে ভক্তদের আগমন নির্বাধ ভাবে চলতে থাকে। মায়ের সীমাহীন ভালবাসা, অন্তহীন করুণা, অতল গভীর একাত্ম বোধে দেশ, কাল, পাত্রের সব গণ্ডি ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেল। মার অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনের লালসায়, মায়ের শ্রীমুখ নি:সৃত বচনসুধাপানের মানসে এখানেও ভক্তের সংখ্যায় অভিবৃদ্ধি হল। তাদের প্রাণের কথা বুঝি এই—

"ক্ষমায় করুণ তুমি, অবারিত দাক্ষিণ্যে মধুর
করুণায় বিগলিত মাঙ্গলিক সঙ্গীতের সুর।
মমতা মাধুরী ঘন রূপময়ী অরূপ বিস্ময়,
প্রসন্ন কমল করে প্রসারিত নিত্য বরাভয়।"

শ্রীশ্রী মা ১৯৩৩ সনে মুসৌরী উত্তরকাশী হয়ে কিছুদিন দেরাদুনে বাস করেন। এইখানে ভারত-রত্ন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জননী শ্রীমতী স্বরূপরাণী, পত্নী কমলা নেহরু, দুহিতা ইন্দিরাকে নিয়ে মার দর্শনে এলেন। রাজনীতিক নেতাদের মায়ের পদপ্রান্তে

উপনীত হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হল। মায়ের দর্শনে শ্রীমতী কমলা নেহরুর ভাবাবস্থা হল। তিনি মাকে কী রূপে যে দেখেছিলেন তা মাই জানেন। কবির ভাষায় বলা যায় —

"আমার নয়ন ভুলানো এলে
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।"

কমলাজী মায়ের চরণে চিরদিনের মত অনুরক্তা হলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মায়ের স্মৃতি বহন করে তিনি সাধনোচিত লোকে গমন করেন। শ্রী জওহরলাল নেহরু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ধারা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। এই সময় অনেক কাশ্মীরী ভক্তদেরও মায়ের চরণে আগমন হয়।

মায়ের লোকোত্তর মহিমা শ্রবণ করে বিশ্ববিশ্রুত যোগী স্বামী যোগানন্দজী আসেন ১৯৩৫ সনে মাতৃ সন্নিধানে। মাতৃ সন্নিধিতে মার দর্শনে তিনি বিস্মিত, পুলকিত, হন অভিনন্দিত।

ঐ কে যায়? উত্তর ভারতের শহরে প্রান্তরে প্রব্রাজিকারূপে শ্বেত বসন-পরিহিতা কুসুমমালা-ভূষিতা ঘনকৃষ্ণকুন্তলবেষ্টিতা সকলের দ্বারে দ্বারে ঘাটে

মাঠে বাটে কে যায় ? "তোমার আনন্দ ঐ এল, দ্বারে এল, এল গো, আহা মরি গো, ঐরূপ মাধুরী হেরি মরি মরি গো।" ঐরূপ, ঐ মধুমাখা হাসি, ঐ চাহনি যে দেখেছে সে মজেছে। প্রব্রাজিকা মা উত্তর ভারতের দ্বারে দ্বারে ১৯৩৬ সনে। সম্বল কেবল একটি লোটা ও কম্বল আর সহযাত্রিণী এক বঙ্গবাসিনী। বিস্মিত হতে হয় কেমন করে সম্ভব হল এই সহায় সম্বল হীন অবস্থায় একটি পরিচারিকার সঙ্গে প্রব্রাজিকা মা বঙ্গদেশের গ্রামের বধূ লাহোর অমৃতসর পর্য্যন্ত ঘুরে এলেন। উত্তর ভারত মায়ের পাদস্পর্শে ধন্য হল। কিন্তু বিশ্বত:চক্ষু মায়ের কাছে যে কোনও কিছুই অজানা অচেনা নেই। নেই কোনো ভাষার বাধা। মা ধনী দরিদ্র সকলের মা। তাই মাকে আমরা ধনকুবের শেঠ সাহুকার রাজা মহারাজের গৃহে যেমন সম্বর্ধিত হতে দেখি, দেখি অভিনন্দিত হতে, তেমনই আবার মাকে কখনো টপকেশ্বরের গুহায় বাজরার রুটিও গ্রহণ করতে দেখা যায়। আবার এটোয়াতে যমুনাতীরে ক্ষেতের সন্নিহিতে এক কুঁড়ে ঘরে বাগ্‌দি পরিবারের সাদরে বিছিয়ে দেওয়া পেঁপে পাতায় বসে তাদের আতিথ্য গ্রহণে রত মাকে আমরা দেখতে পাই। ঐ পেঁপে পাতায় বসে সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকেদের সঙ্গে মার সৎসঙ্গও হত। যাঁরা আসতেন তাঁরাও সকলে পেঁপে পাতায় উপবেশন

করতেন। তারাপীঠে মায়ের দরিদ্র মুসলমান মাতাপিতার কাছে মাকে তাঁদের ছোট বালিকাটি সেজে বসে থাকতে দেখতে পাই। অযোধ্যার রাম-মন্দিরে ভক্ত পরিবৃতা মায়ের বৈদিক দ্বিজকুলের পূজা গ্রহণ অথবা প্রতাপগড়ের রাণীর রাজপ্রাসাদের উপবনে পূজা-উপকরণ গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান সবই সমান মার কাছে। গড় মুক্তেশ্বরে প্রব্রাজিকা মাকে একটি কুম্ভকারের গৃহে ঘট নির্মাণ দর্শনে রত দেখতে পাই। এ সম্বন্ধে মায়ের বাণী— "মাটিটার ত খুব কষ্ট হইতেছে, কিন্তু তবু উহাকে ঘুরাইয়া তৈয়ার করিতেই হইবে। তৈয়ার করিতেই হইলে এমনই কষ্ট দিয়া করিতে হয়।"

এরপর মায়ের কৈলাশ মানস সরোবর গমন। ১৯৩৭ সনে পর্বত-নন্দিনী আনন্দস্বরূপিণী মা চললেন কৈলাশ যাত্রায়। মায়ের মন্দ মরাল গতি, স্মিত মধুর হাসি, অপরূপ রূপদর্শনে পার্বত্যবাসী ধন্য হল, মায়ের কৃপা প্রসাদ লাভের সুযোগ পেল।

মা যেখানেই যেতেন, সেখানেই আনন্দ নির্ঝরিণী অজস্রধারায় প্রবাহিত হত। মায়ের কৃপাবারিতে অভিষিক্ত হতেন সারা ভারতবাসী। হাস্য কৌতুকের ছলেও গভীর তত্ত্বকথা মায়ের শ্রীমুখ থেকে

নিঃসৃত হত। এক ব্যক্তির জিজ্ঞাসা ও মায়ের উত্তর —

প্র : ঘর কোন দেশে ? মা : নাই দেশে

প্র : বাড়ী কোথায় ? মা : ব্রহ্মনগরে

প্র : জিলা ? মা : ব্রহ্মজিলা

প্র : কে আছে ? মা : আত্মানন্দ।

একবার তারাপীঠে একটি অপরিচিত ব্যক্তি এসে মায়ের নাম ধাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। মা নিজের ঘর থেকে ঐ প্রশ্ন শুনতে পান। পরে মা হেসে বললেন, "অব্যক্ত ধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিদানন্দ ঘন শ্যাম নাম।"

১৯৩৮ সনে বালিকাদের শিক্ষার জন্য শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হল হরিদ্বারে। আর বালকদের জন্য দেরাদুনে ১৯৪০ সনে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হল। উদ্দেশ্য মায়ের চরণে মায়ের করুণাধারায় অভিষিক্ত হয়ে ফুলের মতো পবিত্র জীবন লাভে আদর্শ চরিত্র গঠন। পরে কন্যাপীঠ ১৯৪৫ সনে স্থায়ীভাবে বারাণসী আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণেশ্বরে ১৯৩৮ সনে মায়ের চরণে এলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হয়ে। মায়ের

কণ্ঠে ধ্বনিত হল চির উত্তরণের সেই অমোঘবাণী, "এই কাজ যেমন করছ সেই কাজও একটু কর।"

মায়ের পিতা শ্রী বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য দেহ রাখেন ১৯৩৭ সনে। এরপর জননী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী ১৯৩৯ সনে কন্‌খলের নির্ব্বাণী আখাড়ার স্বামী মঙ্গলানন্দ গিরির কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে গৈরিক বসনে ভূষিতা গুরু পদে অভিষিক্তা হলেন। নাম হল স্বামী মুক্তানন্দ গিরি। ত্যাগ ও বৈরাগ্য, প্রেম ও করুণাই হল ভারতের আত্মার মূলস্রোত প্রাণকেন্দ্র জীবনরসের উৎসধারা। এই ধারা যেদিন শুকিয়ে যাবে, সেইদিন ভারতের প্রাণ পুরুষও ম্লান হয়ে যাবে। পরবর্ত্তী কালে মায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী যদুনাথ ভট্টাচার্য্য আশ্রমের সেবার কাজ নিয়ে মাতৃনির্দেশে বাণপ্রস্থ জীবন অবলম্বনে আশ্রমের পার্শ্বভাগেই স্বীয় বাটিকায় বাস করেন।

দিদিমার আগে মাতৃনির্দেশে বাবা ভোলানাথ, কখনো স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরিজী, ভাইজীও কতিপয় জনকে দীক্ষা দিয়েছেন। ভাইজীর সন্ন্যাস নাম স্বামী মৌনানন্দ পর্বত ও বাবা ভোলানাথের সন্ন্যাস নাম হয় স্বামী তিব্বতানন্দ তীর্থ।

রায়পুরে শেঠ যমুনালাল বাজাজ এলেন মার

পদপ্রান্তে। তিনি মাকে দর্শন করে মারই হয়ে গেলেন। শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ ও বিনোবাজী মাতৃদর্শনে কৃতার্থ হলেন। নেহরুজীর সঙ্গে সরদার শ্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল এলেন দেরাদুনে মাতৃদর্শনে। শ্রী মদনমোহন মালব্যজী লাভ করলেন মাতৃপ্রসাদ। মায়ের আকর্ষণ অমোঘ। তাই সেবাগ্রামে রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীকেও মাকে পাওয়ার জন্য আকুল হতে দেখা যায়। ঋজু-ক্ষীণকায় সেই মহাপুরুষ বজ্রের দৃঢ়তা নিয়ে কখনো ভারতের জনগণের সঙ্গে এক হয়ে আবার কখনো একাই এগিয়ে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বৃদ্ধ মহাত্মাজী মাকে নিজের কাছে পাওয়ার আকুলতায় বলেছিলেন — "এমন চোরি করণেওয়ালী কোথায় মিলে ?" তিনি যে চিতচোর, তাই তনুমনপ্রাণ সব হরণ করে নেন।

ধীরে ধীরে দেরাদুন, উত্তরকাশী, রায়পুর, বারাণসী, আলমোড়া, দিল্লী, কলকাতা, পুরী, ভীমপুরা, ভূপাল, পুণা, ধবলচীনা, বৃন্দাবন, আগরতলা, কেদার, জামসেদপুর প্রভৃতি আশ্রম গড়ে উঠল। মায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে মায়ের পূত পাদস্পর্শে অনেক পুরাতন তীর্থগুলি পুনর্জাগরিত হয়ে উঠেছে। যথা নৈমিষারণ্য, কন্‌খল, রাজগীর, রাঁচী, বিন্ধ্যাচল,

তারাপীঠ ইত্যাদি। মায়ের সকল আশ্রমের ভূমির সঙ্গে প্রাচীন কৃষ্টি ও অলৌকিক ইতিহাস জড়িত হয়ে আছে। বারাণসী আশ্রমে নূতন মন্দিরে দেবী অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিতা হন সন ১৯৫০ সনে।

প্রতিষ্ঠিত হল শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ ১৯৫০ সনে বারাণসী আশ্রমে। ১৯৫২ সনে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের আরম্ভ। উদ্যোক্তা সোলন -নরেশ শ্রী যোগীভাই। এরপর আরম্ভ হয় ভারতজননী জগজ্জননী শ্রী শ্রী মায়ের ভারত পরিক্রমা। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে অনবরত অবিশ্রান্ত ভাবে অব্যহত থাকে মায়ের ভারত পরিক্রমা।

ভাগবত সপ্তাহের প্রচলন ও মহাপ্রভুর অধিবাস সহ নাম যজ্ঞের বিভিন্ন জায়গায় সম্পাদন মায়ের এক বিরাট অবদান। রোগরূপী জনজনার্দনের সেবায় মা আনন্দময়ী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয় বারাণসীতে ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ সনে। এর বহু আগে কাশীর স্বনামধন্য চিকিৎসক মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ডা: গোপাল দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সনে "আনন্দময়ী করুণা" ও "শিশু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান" গড়ে ওঠে। নৈমিষারণ্যে ১৯৭৭ সনে "বৈদিক পৌরাণিক শোধ সংস্থানের" প্রতিষ্ঠা হয়। কনখলে ১৯৮১ সনে বিশ্ব

কল্যাণ কল্পে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

সমসাময়িক ভারতের সমস্ত স্টেটের রাজা-মহারাজা যথা সোলন, সুকেত, মণ্ডী, গোণ্ডাল, আম্ব, মোরবী, টিহ্রী, ভূপাল, কাশী, মহিশূর, ত্রিবাঙ্কুর, গোয়ালিওর, ভাবনগর ও বরোদা, প্রতাপগড়, ত্রিপুরা, কাশিমবাজার প্রায় সব জায়গার রাজা মহারাজাই মার চরণে উপনীত হয়েছেন। ধনপতিদের মধ্যে বিড়লা, ডালমিয়া, সিংহানিয়া, জয়পুরিয়া, মোদী, টাটা, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি সকলেই এসে মায়ের চরণে প্রণতি জানিয়েছেন। যেমন সমস্ত রাজনেতৃগণ মায়ের চরণে এসে ধন্য হয়েছেন, তেমনই নৃত্যসম্রাট উদয়শঙ্কর, বিখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর, সরোদ বাদক উস্তাদ আলি আকবর খাঁ, সানাই সম্রাট উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ, সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী এম. এস. শুভলক্ষ্মী মায়ের চরণে এসে নিজেদের কলাকৃতি অর্পণে ধন্য ও তৃপ্ত হয়েছেন।

সুধীবৃন্দ দার্শনিক সমাজের অগ্রদূত মহামহোপাধ্যায় ডা: গোপীনাথ কবিরাজ, সর্বপল্লী ডা: রাধাকৃষ্ণন্, বাংলার শুক্ল সন্ন্যাসী শ্রী প্রাণ গোপাল মুখোপাধ্যায়, ডা: নলিনী ব্রহ্ম, প্রোফেসার ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, ডা: গৌরীনাথ শাস্ত্রী এদের নাম উল্লেখনীয়,

যারা মার পূত সান্নিধ্য লাভ করেছেন বিশেষ ভাবে।

ভারতের চারিটি ধামের শ্রী শংকরাচার্য্য, সমস্ত মঠ ও আশ্রমের সন্ত ও মোহন্ত, মহামণ্ডলেশ্বর যাঁরা মার কাছে এসেছেন, তাঁদের নাম কি করে উল্লেখ করা যায়? সে যে অগণনীয়। তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রভু দত্তজী, শ্রীহরিবাবা, শ্রীউড়িয়াবাবা, শ্রীশরণানন্দজী, শ্রী কৃষ্ণানন্দ অবধুজী, শ্রী দেবী গিরিজী, খান্নার বাবা শ্রীত্রিবেণীপুরীজী, শ্রীরামঠাকুর, শ্রীবালানন্দজী, শ্রী কিরণচাঁদ দরবেশজী, ভাগবত সম্রাট স্বামী অখণ্ডানন্দজী, শ্রীকৃষ্ণানন্দজী, শ্রীকৃষ্ণবোধাশ্রমজী, শ্রী বিষ্ণু আশ্রমজী, শ্রীসীতারাম দাস বাবা ওঁকারনাথ, শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারিজী, শ্রীনরেন ব্রহ্মচারিজী, শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজী, রামকৃষ্ণ মিশন ও আদ্যাপীঠের সাধুরা এঁদের সকলেরই নাম বিশেষ উল্লেখনীয়। সত্যগোপাল আশ্রমের শ্রী গোপাল ঠাকুর মহাশয় বিন্ধ্যাচলে গীতা জয়ন্তী উৎসব প্রবর্ত্তিত করেন।

পরবর্ত্তীকালে "দিব্য জীবন সংঘের" প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শিবানন্দজী, কৈলাশ মঠের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীচৈতন্য গিরিজী, বম্বের সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী মহেশ্বরানন্দজীর নামও বিশেষ উল্লেখনীয়।

সাধুদের সঙ্গে মায়ের অতি মধুর সম্বন্ধ ছিল। মা সব বাবাদের কাছে ছোট্ট মেয়েটি সেজে মধুর বচনসুধায় আন্তরিক আতিথেয়তায় তাঁদের আপ্যায়িত করতেন। মা তাঁদের বলতেন— "বাবারা এই ছোট্ট মেয়েটাকে আদর করে তো, তাই এই ছোট্ট মেয়েটার উট্‌পটাং বুলি শোনার জন্য, এই ছোট্ট মেয়েটাকে দর্শন দেবার জন্য বাবারা সব কত কষ্ট করে এসেছেন।" মায়ের সব বাবারা মায়ের বিনম্র মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মাকে শ্রদ্ধা করতেন আদর দিতেন, মার মুখের বাণী শোনার জন্য ব্যস্ত হতেন।

পরবর্ত্তীকালে দেখতে পাই মার এই সাধু বাবারাই সাদরে এগিয়ে এসেছেন মায়ের উৎসবগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে। শ্রী হরিবাবা ও শ্রী অবধূতজীর নির্দ্দেশে পাঞ্জাবে আম্বালায় মার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সনে। ১৯৫২ সনে খান্নায় অবধূতজীর ব্যবস্থাপনায় সুসম্পন্ন হয় মার জন্মোৎসব। এবার তিথিপূজা স্বয়ং অবধূতজী করেন। পরে যথারীতি বিশুদাও পূজা করেন। একাধিকবার হোলীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মায়ের সন্নিকটে হরিবাবার আগ্রহে। বৃন্দাবনে ঝুলায় বসিয়ে কৃষ্ণ সাজিয়ে হরিবাবার মায়ের পূজা ভক্তদের হৃদয় দেউলে যেন

দেবতার পূজার এক মনোহর ছবি। কৈলাশ আশ্রমের বর্ত্তমান মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজীর আগ্রহে ১৯৭৩ সনে তাঁর আশ্রমে উত্তরকাশীতে মার জন্মোৎসব এবং ১৯৮০ সনে হৃষিকেশে সংযম সপ্তাহ বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বম্বের সন্ন্যাস আশ্রমের বর্ত্তমান মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯৭২ সনে কনখলে সুরত গিরি বাংলাতে ও ১৯৭৭ সনে নর্মদার তীরে চান্দোদে বদরিকাশ্রমে সুষ্ঠুভাবে সংযম সপ্তাহ সম্পাদন করেন। স্বামী পূর্ণানন্দজীর অনুরোধে ১৯৭৮ সনে কনখল পূর্ণানন্দ আশ্রমে মার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেরাদুনে রামতীর্থ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ প্রকাশজী ১৯৭৪ সনে সংযম সপ্তাহ ও ১৯৭৭ সনে মার জন্মোৎসব দেরাদুনে রামতীর্থ মিশনে সম্পাদিত করান। ১৯৭৯ সনে মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী গণেশানন্দজী কুরুক্ষেত্রে সংযম সপ্তাহ করান। হৃষিকেশের স্বামী চিদানন্দজীর সহযোগ ও দান অতুলনীয়।

এত অনুষ্ঠান, এত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু মা যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। সব কিছুর মধ্যে থেকেও যেন কিছুর মধ্যে নেই। সব সাধু মহাত্মাদের কাছে বড়দের কাছে মা যেন তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি। তাই মায়ের অনুষ্ঠান,

প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য অন্যান্য আশ্রমের সাধু মহাত্মাদেরও আগ্রহ দেখা যায়। মার পুণ্য জীবন অনুশীলনে দেখতে পাই মার মূল মন্ত্র ছিল, "যা হয়ে যায়।" তাই মার সংযম সপ্তাহ, দুর্গাপূজা, মার জন্মোৎসব প্রভৃতির উদ্যোক্তা দেখতে পাই সাধু মহাত্মা, রাজা মহারাজা, মন্ত্রী ও রাজ্যপালগণ। আর মা তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি হয়ে সাক্ষী দ্রষ্টা মাত্র হয়ে তাঁদের সেই অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়তেন। যেন কোন কিছুর মধ্যেই নেই। যথার্থই মায়ের স্বরূপ অবর্ণনীয়।

অনুরূপ ভাবেই পাশ্চাত্য জগদ্‌বাসীরাও মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মার চরণে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের জীবন অর্পিত করেছেন, যেমন ব্রহ্মচারিণী আত্মানন্দজী ও স্বামী বিজয়ানন্দের নাম উল্লেখনীয়। অনেক পাশ্চাত্যবাসী মায়ের আশ্রম থেকে দীক্ষিত হয়ে আজীবন সংঘের সদস্যতা গ্রহণ করেছেন। বিদেশেও মায়ের নামে কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

সর্ব সাধারণের জন্য মায়ের বাণী — "পতিকে পরমপতিরূপে, পত্নীকে ভগবতীরূপে ও পুত্রকে বাল গোপালরূপে সেবা করবে। ভগবানের জন্য সারাদিনের মধ্যে ১০ মিনিট সময় দিবে। তখন যেখানেই থাক

ঐ নির্দিষ্ট সময়ে ভগবানের স্মরণ করবে। ঘড়িতে একবার চাবি দিলে যেমন সারা দিন চলে তেমনই প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবৎ স্মরণে অখণ্ড ভগবদ্ ভাবের স্ফুরণ হয়।”

বালক বালিকাদের সঙ্গে মা তাদের মতোই হয়ে যেতেন। মা তাদের বন্ধু সম্বোধন করতেন। একটি দৃশ্যে মানসমরাল উপনীত হয়।

আসামের ডিব্রুগড়ের পথে মা রেলগাড়িতে বসে রয়েছেন। পাণ্ডু স্টেশনে পথচারী এক বালককে দেখে মা ইশারায় ডাকলেন। সে ভিতরে এল। তারপর তার বন্ধুরাও ভিতরে এল। তারা পরবর্ত্তী স্টেশনে স্কুলে পড়তে যায়। মা তাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। একটি ছেলের নাম মুকুল দত্ত। মা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন — “কার কি ভগবানের নাম ভাল লাগে ?”

মা সচরাচর সব বালক-বালিকাদের যে পাঁচটি কথা বলেন সেই পাঁচটি কথা বললেন —

১. সকালে উঠে বলবে আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

২. সত্য কথা বলবে।

৩. গুরুজনদের আদেশ পালন করবে।

৪. মন দিয়ে পড়াশোনা করবে।

৫. খুব খেলবে।

মা তাদের বললেন, "সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ভগবানের যার যা নাম ভাল লাগে সেই নাম একটি নতুন খাতাতে পাঁচবার অথবা দশবার লিখবে। পরে সেই খাতাটি প্রণাম করে রেখে অন্য কাজ করবে। খাতাটি ভরে গেলে জলে বিসর্জিত করে আবার নূতন খাতা নেবে।"

মার কথা পালন করবে তার বলল। সেই ছেলেরা পরে স্টেশনে নামার সময় মাকে বলে গেল যে ফেরার পথে তাদের নাম ধরে ডাকলেই তারা আবার এসে মার সঙ্গে দেখা করবে। মা ফেরার পথে তাদের নাম ধরে ডেকেছিলেন। তাদের দেখতে না পেয়ে তাদের পরিচিত এক ব্যক্তিকে মা বললেন— "মুকুলকে বলবে আমি এসেছিলাম।"

মায়ের করুণার সীমা নেই। নিজের শরীরের দিকে না তাকিয়ে অনবরত ভক্তের আহ্বানে তাদের প্রাণের আবেগে সাড়া দিয়ে অবিরত অবিশ্রান্ত ভাবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পরিভ্রমণ করেছেন। মা বলতেন— "আমি কোথাও যাইনা। কারুরটা খাইনা। আমার তো পাশ ফেরারও জায়গা

নেই। আমি একই বাগানে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি মাত্র।" মা যে বিভু। চরাচরব্যাপিণী মা।

মায়ের দিগন্ত প্রসারিণী এই বাণী— "হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।" আকাশে বাতাশে, জলে-স্থলে, নভোতলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কতশত শোকে তাপে জর্জ্জরিত জীব মাতৃ সান্নিধ্যে দু:সহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করল। কত জীবন মরু-মরীচিকায় ভ্রান্ত তৃষিত মানব মায়ের কৃপাবারি পান করে মায়ের করুণাধারায় সিঞ্চিত হয়ে ধন্য হল। মার কাছ থেকে ব্যর্থতায় আশার বাণী, উত্তরণের বাণী শ্রবণ করল। এই ধরণীর কত নিদাঘ-তাপদগ্ধ জীব মায়ের কৃপাকল্প-তরু স্নেহ সুশীতল চরণ তলে এসে নবজীবন লাভ করল। পুণ্যভূমি ভারতভূমির এই সুবিশাল মহীতরুর সঘন ঘন ছায়ায় বসে তাদের প্রাণের তাপ জুড়াল। অবশেষে অবসান হল ভারত জননী জগজ্জননী শ্রী শ্রী মায়ের এই পরিক্রমার। যে পরিক্রমা আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে স্থিত গুরু দ্রেণের তপস্থলী দেরাদুন নগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল সেই দেরাদুনে এসেই এই পরিক্রমা পূর্ণ হল।

২৭ শে আগষ্ট, ১৯৮২ সন শুক্রবারে সন্ধ্যার করুণ অরুণিমায় সকলের গভীর নিস্তরঙ্গ হৃদয় সাগরে

চিদাকাশে অব্যক্ত ধামে শ্রী শ্রী মা প্রবেশ করলেন। বহু বছর আগে তারাপীঠে এক অপরিচিত জনের মায়ের নাম ধামের জিজ্ঞাসায় উত্তরে স্বরূপ পরিচয়ে যে বাণী ধ্বনিত হয়েছিল মায়ের কণ্ঠে "অব্যক্তধাম" সেই অব্যক্তধামে মা প্রবেশ করলেন। যিনি পূর্ণ, যাঁর ব্যক্ত অব্যক্তের কোন প্রশ্নই নেই, ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, আবার অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত, সেই চিরন্তনী নিত্য সনাতনী, ভূমা স্বরূপিণী মায়ের অব্যক্তে প্রবেশ করেও আবার ব্যক্তে প্রকটিত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে। তিনি যে অঘটন ঘটন পটীয়সী। তাই মায়ের বাণী চির অমর হয়ে রয়েছে— "আমি আগেও যা এখনও তা পরেও তা। তোমরা যখন যে যা বলো, যা ভাবো আমি তাই।" এই বাণী রূপে বাঙ্ময়ী মা সকলের হৃদয়ে নিত্য বিরাজিতা রয়েছেন।

"ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারণায় যা আনিতে পারি, শ্রী শ্রী মা তাহারই মূর্ত্ত প্রকাশ। তাঁর দেহ ও লীলা বিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ, এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্মে, ধ্যানে ও জ্ঞানে তিনিই একমাত্র উপাস্য, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয় বসাইতে পারিলে পরমার্থ পথে অন্য কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে না।" এই কথা

বলেছেন মায়ের ভক্তদের অধ্যাত্ম পথের অগ্রপথিকৃৎ ঋষিকল্প ভাইজী। শ্রী শ্রী মা ভগবানের মূর্ত্ত, প্রকাশ। "ভগ" শব্দের অর্থ পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, পূর্ণ সৌন্দর্য্য, করুণা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও পরাক্রমের পূর্ণতা। এই ছয়টি যাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় থাকবে তিনি ভগবান। মার মধ্যে এই ছয়টি পূর্ণ ভাবে বিরাজ করেছে। কৈলাশ আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজী বলেছিলেন — "মায়ের চরণে অষ্টসিদ্ধি নবসিদ্ধি স্বত:ই লুটিয়ে পড়ছে। আর মায়ের সৌন্দর্য্য ? ত্রিভুবন মোহিনী শ্রী শ্রী মায়ের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বিলাসেই এই জগতের তরুলতা পাতায় সৌন্দর্য্য ছেয়ে রয়েছে। অনুপম দিব্য সৌন্দর্য্য। ঐ রূপ, ঐ চাহনি ভুলবার নয়। যে একবারও দেখেছে সে আর জীবনে ভুলতে পারবে না। মায়ের হাসির জ্যোতিতে ভুবন আলোকিত হয়েছে। মায়ের সীমাহীন করুণার কথা বলে শেষ করা যায় না। মায়ের কৃপায় রোগমুক্তি, বিপদ থেকে উদ্ধারের বিবৃতি যে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস হয়ে যাবে।

পূর্ণ জ্ঞান তো জন্মাবধি। ঢাকাতে দার্শনিক সভাতে সমবেত দার্শনিকদের মধ্যে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মনীষীরা জটিলতম দার্শনিক প্রশ্নের মায়ের মুখের সহজ সরল উত্তরে স্তম্ভিত হন। বাণীর

বরপুত্র অনন্য জগদ্বরেণ্য সুধীপ্রবর পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মায়ের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে বলেছেন "এমনটি আর শুনি নাই, এমনটি আর দেখি নাই।"

মায়ের বাণীর লিপিকার শ্রদ্ধেয় অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় বলেছেন — "তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক সহজাত সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া আমার যেন এই ধারণাই দৃঢ় হইতেছে যে দ্বাপরের শেষ ভাগে কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গণে যুদ্ধকামী রাজন্যবর্গের মহাপ্রলয়ের শস্ত্র-সম্পাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে মহতী বাণী স্বয়ং শ্রী ভগবানের শ্রীমুখ হইতে বিনি:সৃত হইয়াছিল, আজ এতকাল পরে কলির প্রদোষে সেই বাণীই যেন মাতৃমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য ধরাধামে আবির্ভূতা হইয়াছেন।"

কলকাতার খ্যাতনামাপুরুষ পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ মহাশয় মাতৃদর্শনের পর বলেন "শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমানন্দের নিত্য প্রস্রবণের কথা দেখতে পাই, তার সার সত্তার নিগূঢ় নির্য্যাস মায়ের শ্রীমুখমণ্ডলের হাসির রেখায় প্রকাশ পায়।"

কাশীর প্রখ্যাত মহাত্মা শ্রী শঙ্কর ভারতীজী শ্রী শ্রী মাকে "চিদানন্দের প্রকাশ" বলেছেন। শ্রী হরিবাবা

মায়ের মধ্যেই নিজ ইষ্ট শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। অবধূতজী মাকে সাক্ষাৎ সিংহবাহিনীরূপে, কনখলের নির্ব্বাণী আখাড়ার মোহন্ত গিরিধর নারায়ণ পুরীজী মাকে শাকম্ভরী রূপে এবং মায়ের আশ্রমের প্রাণপুরুষ স্বামী পরমানন্দজী মার মধ্যে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞস্থিতি দর্শন করেন। বিখ্যাত বঙ্গ সাধক শ্রী রামঠাকুর মাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলেছেন। শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারিজীর মতে "মা নিত্যসিদ্ধা।" প্রখ্যাত মহাত্মা ত্রিবেণী পুরীজী খান্নার বাবা বলেছেন — "শ্রী শ্রী মার মধ্যে সকল ভাবধারা সাগরে সমস্ত নদীর জলরাশির মতই এসে মিলিত হয়েছে। নদীর জলে যেমন সাগরের হ্রাস বৃদ্ধি নেই, তেমনই মাকে কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না।"

সকল ধর্ম, সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যরা ও সাধকেরা মায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন। শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন — "মা হলেন যে সমস্ত সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত আচার্য্যের উপদেশই আপন আপন দৃষ্টিকোণানুসারে সত্য। তবে উহা খাঁটি এবং ঠিকস্থান হইতে নির্গত হওয়া চাই। মায়ের নিজের কোন পথ নাই, কোন বিশেষ শিক্ষা মতবাদ নাই। তিনি জানেন ভগবান লাভের পথ মূলত: এক হইলেও

ব্যক্তিগত রুচি এবং আধার অনুসারে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এই কারণেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের লোক, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুপরিজ্ঞাত ব্যক্তিগত কারণে মাকে তাঁহাদের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মনে করেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তির কথায়, আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত ধারারই শ্রেষ্ঠ সমর্থক মা।"

তাই শাহবাগে ভাইজীর বন্ধু ৺মৌলবী জয়নদ্দিন হোসেনের সঙ্গে ফকিরের কবরে শ্রী শ্রী মায়ের মুখ থেকে নামাজ পাঠ বিনি:সৃত হচ্ছে দেখতে পাই। হোসেন সাহেবের হাত থেকে মায়ের কবরে-নিবেদিত বাতাসা গ্রহণ ও মুসলমান যুবকের হরিলুটের বাতাসা গ্রহণ, হরিনাম সংকীর্ত্তনে যোগদান মায়ের দরবারের সর্বধর্ম সম্বয়ের অপূর্ব একটি অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে চির অঙ্কিত হয়ে রইল। তারাপীঠে এক মুসলমান মাতৃভক্ত মৌলানা সাহেব মায়ের প্রেমগোপাল একবার মাকে একটি মস্‌জিদে নিয়ে গিয়ে বেদীতে বসিয়ে তারপর তাঁর মুসলমান ভাইদের বুঝিয়েছিলেন যে এই মায়ের মাছে এলে মুস্‌লিম ধর্মকে এতটুকু খর্ব করা হয় না। কারণ মা যে পবিত্র কোরাণ শরিফের বাণীর মূর্ত্ত প্রকাশ।

আরব দেশীয় দুবাইএর এক সিদ্ধ ফকির একজন বিশিষ্ট মাতৃভক্তকে বলেছিলেন, "আনন্দময়ী মা পঞ্চতত্ত্বের জননী। বহিস্ক (স্বর্গ) বহিস্ক কেন কর? মায়ের পাদস্পর্শে পূত ঐ কাশীর আশ্রম কি বহিস্কের থেকে কোন অংশে কম?"

ক্রীশ্চানেরা মায়ের মুখের দিব্য আভায় তাঁদের যীশুর তেজ দেখতে পান। তাই গ্রীসের মহারাণী, কানাডার প্রধানমন্ত্রী ক্রুদোকে মায়ের শ্রীমুখকমলের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। বড়দিনে যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তারা মোমবাতি জ্বালিয়ে মায়ের চরণে বসে বাইবেলের পবিত্র অংশ পাঠ করে। মনে হয়— "সব পথ এসে মিলে গেছে তোমারি দুখানি চরণে।"

ভারত থেকে প্রয়াত দুটি বিদেশিনী মহিলাকে সুইট্জারল্যাণ্ডে এক ফরাসী যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি ভারতের এমন কোন ব্যক্তির নাম বল, যাঁকে জানলে ভারত জানা হয়ে যায়, তবে তোমরা কি কি বলবে?" সেই মহিলাদের মধ্যে একজন নিম্নস্বরে বললেন— "আনন্দময়ী মা।" ঐ পাশ্চাত্ত্য যুবক ভারতে এসে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে হৃষিকেশে দিব্য

জীবন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শিবানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই আনন্দময়ী মা?" উত্তরে স্বামী শিবানন্দজী বললেন, "ভারতের ভূমিতে বিকশিত সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল।"

সকলেই নিজ নিজ প্রজ্ঞার আলোকে মাকে দেখে যথারীতি নিজেদের অভিমত জানিয়ে মাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। আর এই সমস্ত অভিমতই ভাইজীর ঐ পূর্বোক্ত বাণী—"শ্রী শ্রী মা ভগবানের মূর্ত্ত প্রকাশ" এই বাণীরই রূপায়িত রূপ।

অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপিণী শ্রী শ্রী মায়ের মধ্যে পূর্ণ বৈরাগ্য পরিলক্ষিত হত। মায়ের উদাসীনতা সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। মা বলতেন—"এই শরীরটা একটা উড়া পাখি। কখনো কোথাও এসে ঢুকে পড়ে আবার উড়ে যায়। এই শরীরের একটি টিপ সইও কোথাও নাই। এই আশ্রম-টাশ্রম সবই তোমাদের।"

আর পূর্ণ পরাক্রমের কথায় এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মায়ের প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। মহা শক্তি স্বরূপিণী শ্রী শ্রী মা অনেকবার ঝড়, জল, বৃষ্টি, সমুদ্রের তুফান থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন। তাই কৈলাশ আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী

বিদ্যানন্দজীর মুখে উচ্চারিত হল সেই ঐতিহাসিক বাণী "শত শত বর্ষ ধরে এমন মহাশক্তির আবির্ভাব হয় নি।"

কুম্ভের সময় মহাত্মারা মাকে কুম্ভের জ্যোতি বলে অভিহিত করেছেন। শোভাযাত্রায় মায়ের স্থান হত সকলের পুরোভাগে। পুনরায় ভাইজীর ঐ বাণীতেই ফিরে যাই। ভাইজী বলেছেন, "এই মায়ের চরণ আশ্রয় করলে পরমার্থ পথে আর কোন আশ্রয় অবলম্বনের প্রয়োজন হবে না।"

আজকের এই বিষম দিনে চতুর্দিকে নিরাশার এই অন্ধকারে মায়ের চরণ আশ্রয়ই একমাত্র আশার আলোক। মায়ের সেই 'অভী মন্ত্রে' দীক্ষিত হই আমরা— "মা আছেন কিসের চিন্তা ?" "অমি তো সর্বদা তোদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি।" শোকে তাপে জর্জ্জরিত মানবের ঘুচে যাক সমস্ত দু:খদৈনা, মাতৃ কৃপাধারায় যত মলিনতা আবিলতা ধুয়ে মুছে যাক; ধরণীতে আবার মানবতা ফিরে আসুক; মায়ের আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত হয়ে মানব আবার শান্তি লাভ করুক। মায়ের স্নেহশীতল শ্রীচরণতলেই হোক সকলের নির্ভয় আশ্রয় এই প্রার্থনা জানাই মায়ের চরণে।

অবশেষে কবির ভাষায় প্রণতি জানাই—

"রিক্ত মোর করপুট, শূন্য মোর বরণের ডালা,
দীন আমি আনিয়াছি শুধু, এই ছন্দে গাঁথা মালা।
বন্দনা-চন্দন সিক্ত অকিঞ্চন অর্ঘ্যখানি
নিবেদিনু পাদপদ্মে হে জননী নমো নমো নমঃ"

শতবাণী কুসুমাঞ্জলি

শতবাণী কুসুমাঞ্জলি

১. হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা।

২. যতক্ষণ আমি ততক্ষণ তিনি নাই। আমার মৃত্যু তাঁর প্রকাশ।

৩. অমর আত্মা অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি।

৪. দল ছাড়লে সবই যোগ।

৫. যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী।

৬. অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সফলতা প্রয়োজন। সত্যানুসন্ধানে লেগে যাও। সত্য লাভ আকাঙ্ক্ষায় তাঁর কাছে প্রার্থনা কর — "ঠাকুর, তুমি ছাড়া যে আমার দিনগুলি বৃথা চলে যাচ্ছে। আমাকে দয়া কর।"

৭. যাঁকে পেলে অখণ্ডমণ্ডলাকার নিখুঁত প্রকাশ, সেই তো নিজেকে পাওয়া।

৮. নিজে শিষ্য হতে চেষ্টা কর। গুরু মিলবে। কৃপা পাওয়ার দিক খুলবে। করুণা ধারার সন্ধান মিলবে। প্রার্থী হলেই জিনিষ মিলবার সম্ভাবনা।

প্রার্থী তো হও

৯. ভগবানকে জানা, আপনাকে জানা। আপনাকে জানা, ভগবানকে জানা।

১০. ভগবানের এক নাম চিন্তামণি। তিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন বলে জীব তাঁকে চিন্তা করলে ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা থাকে না।

১১. ভগবানের নাম হবে, আর পবিত্রতা আসবে না—এ কি হয়। যেখানে তাঁর নাম, সে স্থান পবিত্র ধাম।

১২. সৎসঙ্গ, সৎকথা, সৎ পরিবেশ, যাই বল না কেন, নামের মধ্যেই তো সব। আবার সৎ-চিন্তন, সৎ বিচারের রাস্তাও নামেই খোলে। তাই সত্য প্রকাশের অনুকূল ক্রিয়া নাম।

১৩. যা সকলেই চায় তা পাবার সহায়ক কর্মই ধর্ম্ম। তাই স্বভাবের কর্ম। আর যা অশান্তি দু:খ আনে তা অভাবের কর্ম—অধর্ম।

১৪. মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ। মানব জন্ম সব

জন্মের সেরা। মানুষের মনোরাজ্যে এমন সব গুপ্ত সম্পদ নিহিত আছে যা জগতের আর কোথাও নাই। ডুবুরীর মত নিজের অন্তরের গভীরতায় ডুবে অহর্নিশি সেই সব রত্ন উদ্ধারের চেষ্টা কর। ইহাই পরম পুরুষার্থ, ইহাই পরম ধর্ম।

১৫. ভজন কাকে বলে? 'ভ' মানে ভগবান, যে আপনজন তার উপলব্ধির প্রক্রিয়াই ভজন। ইহাও ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। তবে সদ্ ইচ্ছা জাগরিত হলে ভগবানই তা পূরণের জন্য কৃপা করেন।

১৬. অশান্ত হলে পরেই সুশান্তকে পাওয়া যায়। শান্তি পেতে হলে তাঁর জন্য ব্যাকুল হও। তিনি তো হাত বাড়িয়েই আছেন।

১৭. বিপদ মানুষের উপরেই আসে। কখনো নিরাশার ভয়ঙ্কর কালো — মেঘ সব দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। কিন্তু চিন্তা কি? ভগবান তো আছেনই। তাঁর স্মরণে সব কালো মেঘ কেটে যায়।

১৮. বৈষ্ণব আর শাক্ত? বৈষ্ণব কাকে বলে?

যার নিকট সর্বত্র বিষ্ণুর প্রকাশ। আর শাক্ত? যে কেবল মাকে দেখে। কিন্তু সব ভাবের স্ফুরণ, উৎস সে তো একই স্থানে। কার নিন্দা, কার স্তুতি?

১৯. এই শরীরের কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই, এমন কি যারা মনে করেছে তাদেরও।

২০. পাপ পুণ্য? পাপী পুণ্যাত্মা? যেমন নদীর স্রোত বিষ্ঠা ও চন্দন সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বাতাস দুর্গন্ধ সুগন্ধ কি বিচার করে? সূর্য্য সর্বত্র আলো দেয়। এ শরীরের নিকটও সেই কথা।

২১. নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপ সাগরে ডুব দেওয়া যায়।

২২. দুই রকমের প্রণাম আছে, জানিস? পূর্ণ ঘট উপুড় করে জল ঢালার মতো নিজের হৃদয়-মনের সকল ভাব উজাড় করে নমস্যকে সমর্পণ করে দেওয়া।

২৩. শুভ মতি দিয়ে কর্ম কর, কর্মের ভিতর দিয়েই

ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা কর।

২৪. সব কাজেই তাকে ধরে থাক, তা হলে আর কিছুই ছাড়তে হবে না।

২৫. যখন যে কোন কাজ করবে, কায়-মনো-বাক্যে সরলতা ও সন্তোষের সহিত তা করবে, তা হলে কর্মে আসবে পূর্ণতা।

২৬. যাঁর মাথা তাঁরই তো পা। সকলে সকলভাবে একেরই তো পূজা করছে।

২৭. প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ, প্রার্থনার শক্তি অমোঘ এবং প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত।

২৮. কেবল শিশুর মত বিশ্বাস চাই। অভ্যাসের দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে। শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হলে সরল প্রার্থনা আসে।

২৯. সর্ব্বধর্মই একধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।

৩০. এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।

৩১. শব্দই জগতের আদি কারণ; নিত্য শব্দ বা সদ্‌বাণীর ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সৃষ্টিরও বিবর্ত্তন বা বিকাশ সমান ধারায় চলেছে।

৩২. আকুল ভাবই পূজা, অর্চ্চনার প্রাণ। অন্তরেই মহাশক্তির প্রস্রবন এবং সকল চেষ্টাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল বিদ্যমান।

৩৪. 'আমাকে' সরাতে পারলে 'তোমাকে' পাওয়া যায়। সাধন ভজনের লক্ষ্যই হচ্ছে অহঙ্কার চুরমার করে দেওয়া।

৩৫. কর্ম ও ধর্ম জগত উভয় ক্ষেত্রেই ধৈর্য্যই প্রধান অবলম্বন।

৩৬. চাইলেই পাওয়া যায়, তবে মনে মুখে সর্ব্বভাব এক করে চাওয়া চাই।

৩৭. একটা কিছু আশ্রয় কর, তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা কর, তাহলে দেখতে পাবি বাঁশ সংলগ্ন বালতিটি কুয়োয় ফেলে দিলে যেরূপ জলপূর্ণ হয়ে উপরে অনায়াসে চলে আসে, সেই রূপ তাঁর কৃপা অজস্র পেতে পারবি।

৩৮. তোদের দেখলে কখনো তোদের জন্ম-জন্মান্তরের ছবি আমার চোখে ভেসে ওঠে।

৩৯. স্ব-স্ব ভাবানুযায়ী একনিষ্ঠ ধ্যান, ধারণা ইত্যাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটে।

৪০. প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করবে, 'হে অন্তর্যামী দেবতা, প্রতি জীবের হৃদয়ে তোমার দিকে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তি ও অনুরাগ জাগিয়ে দাও।'

৪১. সংসারের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে ডেকে বোলো, "দেখ, তোমাদের যে প্রভু, এখন তাঁর নিকট যাচ্ছি আমাকে তোমরা পথ ছেড়ে দাও।" এই বলে নিশ্চল মনে আসনে বসবে।

৪২. আমি তোদের ভালবাসি বলেই তো তোরা ভালবাসিস। আমি যতো ভালবাসি তোরা যে তার এক কণাও আমায় ভালবাসিস্ না, তা'তো তোরা বুঝিস না।

৪৩. আমার কথা বিশ্বাস করো —— নাম জপ করো, নিশ্চয়ই ফল পাবে।

৪৪. ভোগ মাত্রেই খাদ্য। এ কারণে হুশিয়ার থাকবি, খাদ্য যেন তোদের না খায়। তোরা সর্বদা খাদ্যকে আত্মাধীনে রাখার চেষ্টা করবি।

৪৫. শুভ কর্ম্ম করতে করতে অশুভ সংস্কার গুলি জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়; শুভ সংস্কার বাড়তে থাকে, ক্রমে তারাও লোপ পায়। যেমন কাঠ থেকে আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুনেই কাঠ ভস্ম হয়ে যায়; শেষে অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়।

৪৬. জীবের দেহের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আত্মার দিকেই লক্ষ্য রেখে জীব-সেবা করবি; তাহলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি সেবা, সেব্য ও সেবক তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

৪৭. হিন্দু মুসলমান বা অন্যান্য জাতি সবাই তো এক, একজনাকেই তো সবাই চায়, সবাই ডাকে। নামাজ যা কীর্ত্তনও তা।

৪৮. পোকা, মাকড়, মাছি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ, সবাই তো এক পরিবার কার সঙ্গে কার জন্ম-জন্মান্তরের কিরূপ সম্বন্ধ রয়েছে কে বলবে ?

৪৯. যারা কিছু করতে অক্ষম, যাদের ধর্ম জীবনের কোন সহায় নেই, তাদেরই আমার বিশেষ প্রয়োজন।

৫০. বুঝ, অবুঝ নিয়েই তো ভগবানের সংসার, যার যেমন খেলনা দরকার, তাকে তাই দিয়ে শান্ত রাখতে হয়।

৫১. তুমি শান্তভাবে বসে যে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে, তা লক্ষ্য করতে থাক, আর কিছু করবার প্রয়োজন নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসই তোমার প্রতীক।

৫২. হৃদয় হল সব সুখ-দু:খ অনুভবের স্থান কিনা ? আবার প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ভগবানের আসন। যাঁর আসন তাঁকে বসাতে না পারলে চির শান্তি হয় না।

৫৩. কেবল নাম। তিনি বিপদ দিয়ে বিপদ দূর করেন। এই শেষ কষ্ট মনে করা। আর ত কষ্ট হবে না। শুধু সর্ব্বাবস্থায় তাঁকেই ডেকে কাঁদতে হয়।

৫৪. ব্যাকুলতা এমন হওয়া চাই যেন ঘরে আগুন

লেগেছে, বের হতেই হবে। আর থাকা যায় না।

৫৫. মোহটাকে মহান ভাবের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। তাঁর দিকই দিক। অন্য কোনও দিকেই আর শান্তি নাই।

৫৬. দেহ সংযম, বাক্ সংযমত অনেক সময় হয় কিন্তু মনঃ-সংযমের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা দরকার।

৫৭. যে দৃষ্টিতে যা দেখবে সেই-ই। শক্তির খেলায় হচ্ছে প্রকাশটা। অব্যাক্ত প্রকাশ যা তাও সেই-ই।

৫৮. সংসার মানে সংশয়ের জায়গা। যে সং-কে সার মেনেছে সে-ত সং সেজে এসেছে, এইজন্য সংসার।

৫৯. বন্ধু কাকে বলে ? যে ইষ্টের দিকে মন করিয়ে দেয়। সেই ত পরম বন্ধু। যে এর দিক হতে সরিয়ে মৃত্যুর দিকে গতি করিয়ে দেয় সে শত্রু, মিত্র নয়।

৬০. আবরণ নষ্ট করার জন্য কর্মের প্রয়োজন।

তোমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন তাই দিয়ে তুমি কাজ কর। তাঁর কৃপা অহৈতুকী। কেন কৃপা করছেন না এ তাঁর মৌজ।

৬১. যদি মহাপুরুষের নিকট আস, তবে অবনতি হতেই পারে না। আগুনের নিকট যাবে আর তাপ লাগবে না এ হতেই পারে না।

৬২. অখণ্ড কৃপা হলে অখণ্ড প্রকাশ। যতটা করবে ততটাই পাবে। এক হয় কর আর পাও। এর আগে গেলে দেখা যায় আমার কর্মের ফলে এই কৃপা আসেনি।

৬৩. আত্মদর্শন, প্রত্যক্ষ দর্শন মানে কি? দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দর্শন — এই তিন যেখানে, সেখানে ব্রাহ্মী স্থিতি হয়। যেখানে ক্রিয়া অক্রিয়ার কথা নাই, তাই হল আত্ম স্থিতি। আর যদি রূপ দৃষ্টিতে দেখ তবে সর্ব্বত্র। যেমন বলে না, যত্র তত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।

৬৪. মাকে জানা মানে মাকে পাওয়া আর মা হয়ে যাওয়া। মা মানে আত্মা, মা মানে ময়। স্ব-ময় আত্ম সত্তা ঐ-ইত।

৬৫. জ্ঞান স্বরূপ আত্ম স্বরূপ, শিব স্বরূপ হয়ে যাওয়া মানে আছেইত। যেমন পিতা-পুত্র-পতি একই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম একেরই। সর্ব্বরূপ তাঁরই।

৬৬. এইদিকে এলে অভাব জাগরণ হয়। আরও আগে গেলে এই অভাব স্বভাবে যাবার প্রথম stage, তাঁকে ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার। দুনিয়ার কোন আকর্ষণ নাই এই-স্থিতিতে তুমি এসে গেছ একথা বলা হচ্ছে না। তাঁর জন্য ব্যাকুলতা ও অগ্রসর হওয়া। আজও পাওয়া হল না। কি করে দিন কাটে ?

৬৭. ভগবৎ শক্তি ভগবানের কাজে না লাগিয়ে দুনিয়ার কাজে লাগালে শক্তি ক্ষয় হয়। পরমার্থ শক্তিকে দুনিয়ার দিকে লাগালে এই শক্তির ধারা খণ্ডিত হয়ে যায়।

৬৮. সাধন করতে করতে শক্তি যদি এসে যায় তবে তার ক্ষয় করা উচিত নয়। বিভূতি সবই ভগবানের বিভূতি, তাঁর মায়া, তাঁর লীলা, তাঁরই খেলা। এই খেলার মধ্যে হরি চিন্তনে না রেখে তোমার যা প্রাপ্তি হয়েছে তাকে

দুনিয়ার ব্যবহারে লাগান ঠিক নয়।

৬৯. মোহেতে ফেঁসে যাওয়া, আর প্রেমে আপনা প্রকাশ। মোহে ফেঁসে গেলে হায়-হায় করতে হয়।

৭০. যে পরম বন্ধু সে কখনও ধোকা দেয় না। দুনিয়ার দৃষ্টিতে ত্যাজ্যপুত্র হতে পারে, কিন্তু ঐ বন্ধু ত্যাগ হয় না।

৭১. নিজকে জানবার চেষ্টাই পরম পুরুষার্থ।

৭২. যতকাল ভগবানকে না পাওয়া ততকাল তাঁর খোঁজ বন্ধ না করা। চাই ধ্যান — চাই জপ — একটা কিছু কর। ভগবৎ চিন্তনের চেষ্টা কর। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার আবরণ রয়ে গেছে। নিবারণ করবার চেষ্টা কর।

৭৩. হরি-চিন্তনেই মন বশ হয়। অভ্যাস যোগ বলে না-সৎসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, জপ- ধ্যান সব রকমের অভ্যাস করা।

৭৪. ভগবানকে ছেড়ে আর তুমি কোথায়? ঐ ঝলক কোন রূপে কোনভাবে প্রকাশ হয়। যার দুনিয়ার বস্তুর কোন অভাব নাই—

অর্থাভাব নাই, মোটর, ঘরবাড়ী সব কিছুই মজুদ, কিন্তু শান্তি কই? তুমি জ্ঞান স্বরূপ, শান্তিরূপ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইটি না পাচ্ছ ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তি নাই।

৭৫. দুই হতেই দ্বন্দ্ব, দুঃখ। অভাব হতে দুঃখ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তি পেতেই পার না।

৭৬. নিজের ঘরে যাবার চেষ্টা কর। পরের ঘরে অপরে সঙ্গে থাকলে দুঃখ দ্বন্দ্ব মানে দুই নিয়ে অন্ধ। অন্ধকার মানে অজ্ঞান।

৭৭. মনে রেখো, সেই পরম পতিকে ত তোমরা দেখতে পাওনা; সেই পরম পতিই ঘরে ঘরে পতিরূপে তোমাদের কাছে আছে ত। সেই ভাবে সেবা করবে।

৭৮. যে কাজ স্বইচ্ছায় হাতে নেবে পূর্ণাঙ্গীন চেষ্টা করা দরকার।

৭৯. তাঁর জন্য মন, প্রাণ, শরীর দিয়ে কাজে লেগে যাও, সময় ত চলে গেল।

৮০. দেখ সংসার কি রকম জান? যেন কাঁটার

মধ্যে গিয়ে ঢুকেছ, চারদিকে কাঁটা লেগে যাচ্ছে। একদিক ছাড়াতেই অন্যদিকে লাগছে। এইভাবে চেষ্টা করছ। তোমার এই অবস্থা দেখে একজন এসে তোমাকে সাহায্য করে কাঁটা ছাড়িয়ে বার করে দিল। এই রকম হয়। তুমি চেষ্টা করতে থাক দেখবে সাহায্য পাবেই।

৮১. একত কিছুই বৃথা যায় না; আর, তার প্রাপ্য না হলে সে পেল কেন? তোমরা বাইরে তাকে যেমনই দেখ, হয়ত কৃপা পাবার সে উপযুক্ত হতেও পারে।

৮২. দেখ, তোমরা যদি নিজ নিজ গুরুকে একটি গণ্ডির মধ্যে বন্ধ না করে দেখ তবে সর্বময় দেখতে পারবে, সেই হল গুরুকে প্রকৃত দেখা।

৮৩. দেখ, যতক্ষণ জ্বালা ততক্ষণই বুঝবে ভিতরে ঘা আছে। ঘা থাকলেই জ্বালা।

৮৪. তোমার করণীয় কর্মকরা হলেই কৃপা স্বভাবতঃ প্রত্যক্ষ প্রকাশ হয়, একথা যেমন সত্য, আবার অহৈতুকী কৃপাও সেইরূপ সত্য। কেন হয় একথা বলা চলে না।

৮৫. ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বিচার, বুদ্ধি বা লোকে কি বলবে, কিছুই এই ভাবের কাছে দাঁড়ায় না, যা হবার হয়ে যাচ্ছে।

৮৬. সঙ্গ করা হয় কই? কাছে এলেই কি বিশেষ সঙ্গ করা হয় বা ২/৪টি কথা শুনলেই কি সঙ্গ করা হয়? সেইরকম ত মশা মাছিও করছে।

৮৭. আপনাকে দর্শন করাই ত চাই। আপনাকে জানার জন্যই ত যত সাধন ভজন।

৮৮. শ্বাস হল বায়ু, বায়ুত সর্ব্বব্যাপক, ঐদিকে লক্ষ্য থাকলে ঐ রকম, ভাবটাও সর্বব্যাপী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৮৯. যে কোন আশ্রয়েই হোক, নানা অগ্র হতে এক অগ্র না হলে যে সমগ্র সেই এক জনের সন্ধান পাবে না।

৯০. যখন চেষ্টার মধ্যে আছ, তখন চেষ্টা করাই দরকার। কখন যে সেই সময় আসবে কেউ ত জানে না।

৯১. নিশ্চয় হতে হবে। তোমরা 'হবে না হবে

না' এভাব মনে এনো না। দেখ না, ভগবান-কে ভাবতে ভাবতে তদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে যায়, তাই 'হবে না হবে না' ভাবতে নেই। 'হবে হবে' ভাবতে ভাবতে হয়েই যায়। সংশয় আনা পাপ। তোমরা চিন্তা করছ কেন? সকলেরই হতে হবে।

৯২. সেও যে তাঁরই একরূপ। তুমিও যে তিনিই। বেশ মজা কিন্তু, তুমি মনে করছ তুমি তাঁর থেকে ভিন্ন।

৯৩. তোমাদের ভয়ের কিছু নাই। চেষ্টা ও শক্তি আছে বলেই বলা হয়, চেষ্টা কর, নতুবা তিনি না করালে কিছু হয় না।

৯৪. শরীর রক্ষা কেন করবে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি এই মনে থাকে তাঁকে ডাকব, এই জন্য শরীর রক্ষা দরকার ততটুকুই করবে, ভোগের জন্য নয়। ভোগ ত পশু পাখীও করে যায়। (কর্ত্তব্য) ডিউটী পূরণ করে যাও, তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখ।

৯৫. সত্য কথা, সত্য ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখবে। একদিন হয়ত ঠিক ঠিক হল না। কিন্তু

অভ্যাস করতে করতে পরে কঠিন বোধ হবে না। আনন্দ পাবে।

৯৬. অভ্যাস হয়ে গেলে তাতেই আনন্দ পাবে। এই জন্যই বলা হয় তাপ সহ্য কি না, 'তপস্যা।' ভগবানের জন্য তপস্যা কর। অর্থাৎ তাপ সহন কর।

৯৭. পিতা, মাতা এবং যাঁর নিকট হতেই আমরা গূঢ় বিষয় একটুও জানতে পারি তিনিই গুরু। যিনি রাস্তার খবর একটুও দেন তিনিই গুরু।

৯৮. আশ্রম বল তো, বিশ্ব জোড়া একই আশ্রম। আশ্রম অর্থাৎ যেখানে শ্রম নাই।

৯৯. তোমরা সমবেতভাবে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর। যেমন খাওয়া হয় এক সঙ্গে, সৎসঙ্গে কীর্ত্তনে বসা হয় একসঙ্গে, তেমনি একত্রিত হয়ে আধ্যাত্মিক কর্ম করাও যায়।

১০০. মনকে শুদ্ধ ভোজন দাও। তার দিকে বেশী সময় মন দিলে সকলের মধ্যেও ভগবদ্ বুদ্ধি

হওয়ার আশা থাকে। চিত্ত দর্পণ নির্মল হলে ভগবান স্বয়ংপ্রকাশ। শেষ নিশ্বাসে যে স্থিতি, বর্ত্তমান ঐ স্থিতি অনুসারে প্রাপ্তি হয়।